Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 295 – 305
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু' : লোক ঐতিহ্যের আখ্যান

সঞ্জয় রায়
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : sanjoyroymng75@gmail.com

Keyword
লোকসংস্কৃতি, বাউরী, লোহার, শিকারী, আদিবাসী, ভগীরথ মিশ্র।

Abstract
আমরা জানি নশ্বর এই জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। যে মানুষ তার অস্তিত্বের জানান দিয়ে সর্বদা অহমিকা প্রকাশ করে সেও এই প্রকৃতির কাছে অসহায়। অর্থাৎ বিশ্বজগতের অপার সৃষ্টির মাঝে সে কীট মাত্র। তবুও গুটিকয়েক সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান মানুষ তাদের কর্মজীবনের মধ্যে দিয়ে স্বরণীয় হয়ে থাকে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করার পরেও। ঠিক তেমনি কোনো সংহত সমাজ থেকে উত্থিত রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার থেকে উক্ত সমাজের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। যে সংস্কারগুলো সাধারণত ঐতিহ্য আশ্রিত এবং বংশানুক্রমে গ্রহণীয়। সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় যা 'লোকসংস্কৃতি' নামে পরিচিত। সুতরাং লোকসংস্কৃতির অভ্যন্তরে কোনো জনগোষ্ঠীর বিবর্তনের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান সচেতন সমাজেও যার ধারা নদীর স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত। ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র সংহত সমাজে প্রচলিত লোকসংস্কৃতির সেই ধারাটিকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন তাঁর 'জানগুরু' উপন্যাসের মধ্যে। নাগরিক সভ্যতার সীমানা থেকে বহু দূরে অবস্থিত বাউরী, লোহার, শিকারী, আদিবাসী সমাজের গভীরে প্রবেশ করে তিনি মণিমুক্তোর ন্যায় তুলে এনেছেন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি ভগীরথ মিশ্র এই সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত মানুষদের সুখ-দুঃখকে স্থান দিয়েছেন উপন্যাসের বিষয়বস্তুর মধ্যে। তুলে ধরেছেন মানুষের অজ্ঞানতাকে, যাকে আশ্রয় করে দীর্ঘদিন ধরে সমাজে মান্যতা পেয়ে এসেছে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস, কুসংস্কারের মতো বিষয়। কুসংস্কার মানুষের অজ্ঞানতার ফল হলেও, সকল মানুষের ক্ষেত্রে তা নয়। সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এই কুসংস্কারকেই ব্যবহার করেছেন শ্রেণি শোষণের হাতিয়ার হিসেবে। আবার অনেক সময় এই সংস্কারকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসবের মুহূর্ত গড়ে উঠেছে। 'জানগুরু' উপন্যাসের গোটা অংশ জুড়ে যে প্রসঙ্গটি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে এবং কাহিনিকে গতি প্রদান করছে তা হল ডাইনি প্রথা। তৎকালীন সময়ে প্রচলিত ডাইনি প্রথার মর্মান্তিক দৃশ্য ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন নিজস্ব শৈল্পিক দক্ষতায়। সমাজের প্রতি পদে একজন নারীকে যে কত কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হয় সেই দিকটিও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি।

সুতরাং লোকসংস্কৃতির পরিমণ্ডলে ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনচর্যা প্রতিনিয়ত কেমন করে পরিচালিত হয়, উপন্যাসের বিষয়বস্তু আলোচনার নিরিখে তারই পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

Discussion

উনবিংশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের যে পথ চলা শুরু হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখনীর স্পর্শে এক সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। যে পথের চারিদিকে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয় সমাজের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত তথা সমাজের উচ্চমঞ্চের অভিজাত শ্রেণির দৈনন্দিন জীবন চেতনার কাহিনি। যেখানে পল্লী জীবনের সাধারণ মানুষের কথা উঠে আসলেও নাগরিক সভ্যতার প্রাধান্যই তুলনামূলক ভাবে বেশি। কিন্তু বিশ শতকের শেষের দিকে অর্থাৎ সত্তরের দশকের পরবর্তীতে সেই ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন সূচিত হয়। ঔপনিবেশিকতার অবসান তথা উত্তর ঔপনিবেশিক পর্বে উচ্চবিত্তের বদলে নিম্নস্তরের মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রামই ধীরেধীরে সাহিত্যের পাতায় স্থান পেতে শুরু করে। কেননা উত্তর ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ভিত্তি হল প্রান্তিকের বিদ্রোহ, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। ঔপনিবেশিক যুগে যে ভাবনাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার বিকাশ ঘটেছিল, সেই মূল বিষয়বস্তুর বিরূদ্ধাচরণকেই উত্তর ঔপনিবেশিকবাদে প্রাধান্য দেওয়া হল। যার মধ্যে দিয়ে সাহিত্যের বিষয় আঙ্গিকে এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এতদিন যাবত যাঁরা ছিলেন উপেক্ষিত, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের সঠিক মূল্যায়ন করা হত না, যাঁদের আর্তনাদ আমাদের কানে পৌছোলেও মরমে ততটা আঘাত হানতে পারে নি; উত্তর ঔপনিবেশিক যুগে তারাই অধিকার করল মা সরস্বতীর দানসত্ত্ব। তারাই প্রতিবাদের এক একটি মুখপাত্র হিসেবে দেখা দিতে লাগল। ফলস্বরূপ বাংলা সাহিত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পেল অন্ত্যজ শ্রেণির আখ্যান বা 'সাব অল্টার্ন ডিসকোর্স'। কিছু সংখ্যক প্রতিভাবান লেখকবৃন্দের বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিকল্পনার আতিশয্যে, তথাকথিত নিম্নবর্গের সমাজ ও তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের আলোকে ভাস্বর হয়ে উঠল। যা যান্ত্রিক সভ্যতার মোহ কাটিয়ে গ্রাম বাংলার মেঠোপথ অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে গোষ্ঠীবদ্ধ জঙ্গলাকীর্ণ আদিবাসী পাড়ায়। ভগীরথ মিশ্রের সাহিত্যসৃষ্টিতেও যার কোনোরূপ ব্যাতিক্রম ঘটেনি। তাঁর একাধিক উপন্যাস-ছোটগল্পে এই সব দরিদ্র, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, শোষিত প্রান্তিক জনজীবনের কথা প্রতিফলিত হয়েছে বারবার।

বাংলা সাহিত্য আকাশে ভগীরথ মিশ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল 'লিটল ম্যাগাজিন'-এর হাত ধরে। জন্ম সূত্রে তিনি পশ্চিম মেদিনীপুরের অধিবাসী হলেও কর্মজীবনের প্রারম্ভিক সূচনা হয়েছিল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরে জয়েন্ট বি.ডি.ও পদে যোগদানের মাধ্যমে। দীর্ঘদিন এখানে কর্মরত থাকার খাতিরে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বালুরঘাট থেকে 'মধুপর্ণী' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'কদমডালির সাধু' প্রকাশিত হয় এবং এর পরের বছর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয় আরও একটি গল্প 'লেবারন বাদ্যিকর'। গল্প রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করলেও তাঁর সৃষ্টিশীল মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের বিষয় ভাবনার। ১৯৯০ সালে 'প্রমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্গত নীলশ্রোত'। পরবর্তীতে তিনি বাংলা সাহিত্যকে একে একে উপহার দেন 'তস্কর' (১৯৯২), 'আরকাঠি' (১৯৯৩), 'চারণভূমি' (১৯৯৪), 'জানগুরু' (১৯৯৫), 'মৃগয়া' (১৯৯৬), 'ফাঁসবদল' (২০০১), 'শিকরের ঘ্রাণ' (২০০১) প্রভৃতি উপন্যাস। ভগীরথ মিশ্রের সাহিত্য সৃষ্টির অধিকাংশ স্থান জুড়েই রয়েছে নিম্নবর্গীয় জনজাতির জীবনের আখ্যান। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে সিভিল সার্ভিস চাকরি করার সুবাদে অনেক জায়গায় ঘোরার সৌভাগ্য যেমন হয়েছিল, তেমনি সমাজের নানা জাতি-জনজাতির মানুষের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। অন্যদিকে, গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ হওয়ায় সেখানকার বসবাসকারী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের বৃত্তি ও সাংস্কৃতিকে তিনি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত –

> "গ্রামে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আর, এমনই সে গ্রাম, যেখানে এই ১৯৯৬ তেও একটি সাপ্তাহিক হাট নেই। গ্রামীন জীবনের চোরাস্রোতগুলিক আমি দেখেছি, চেনারও চেষ্টা করেছি। গ্রামীন মানুষের মানসলোকটি ঐ ভুবনের একজন সদস্য হিসাবে যতটুকু চেনা যায় ততটুকুই চিনি।"[১]

ফলে গ্রামীন পরিবেশ কেন্দ্রিক বাস্তবমুখী এই জীবন অভিজ্ঞতার ছাপ ধরা পরে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে, যা ঐতিহ্যবাহী ও বৈচিত্র্যময়।

ভগীরথ মিশ্র যে সকল উপন্যাসে নিম্নবিত্তের জীবনচর্যা ও পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ঐতিহ্যবাহী ধ্যান ধারণাকে লিপিবদ্ধ করেছেন 'জানগুরু' তার মধ্যে অন্যতম। আলোচ্য উপন্যাসটিতে রাঢ় বঙ্গের আদিবাসী সমাজে প্রচলিত ডাইনি প্রথার এক ভয়ঙ্কর রূপ পরিলক্ষিত হয়। ডাইনি প্রথা একজন নারীর জীবনে কিরূপ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করতে পারে এবং একদল সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী ব্যাক্তি সকলের অগোচরে এই প্রথাকে কিভাবে পরিচালনা করে থাকে তারই পরিচয় পাওয়া যায় জানগুরু উপন্যাসে। পাশাপাশি বাউরী, লোহার, শিকারী সম্প্রদায়ের মানুষের লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক দিকটি তথা লোকসাহিত্য, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার ইত্যাদি আনুসাঙ্গিক বিষয়গুলোকে লেখক বিধৃত করেছেন নিজস্ব শৈল্পিক দক্ষতায়।

লোকসাহিত্যের অন্যতম একটি উপাদান হল ধাঁধা। প্রাচীনকাল থেকে মানব সমাজে মুখে মুখে ধাঁধা উচ্চারিত হয়ে আসছে। বৈদিক যাগযজ্ঞ থেকে শুরু করে অন্যান্য ধর্মীয় আচার, বিবাহ, সামাজিক বিভিন্ন উৎসব এমনকি অবসর বিনোদনের খাতিরেও ধাঁধার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ধাঁধার উৎস প্রসঙ্গে ব্লুমফিল্ড মন্তব্য করেছেন –

> "সুপ্রাচীন কাল থেকেই আদিম মানুষের মন পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে যে-চেষ্টা করে চলেছে, তারই পরিণতি হিশেবে ধাঁধার সৃষ্টি।"[২]

এটি সম্পূর্ণ রূপে মোখিক এবং দ্বৈত ভূমিকা সম্পন্ন। স্থান ভেদে ধাঁধা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত যেমন, ময়মনসিংহে 'কথা', দিনাজপুরে 'কিচ্ছা', কোচবিহারে 'ছিলকা' প্রভৃতি। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন –

> "ধাঁধার আবেদন গ্রাম্য মানুষের হৃদয়ের কাছে নয়, তার আবেদন বুদ্ধি এবং জ্ঞানের কাছে। প্রতিটি ধাঁধাই একটি জ্ঞানের বিষয়কে কৌতুকের ছদ্মবেশে চাতুর্যপূর্ণ ভাষার সহযোগিতায় পরোক্ষে ব্যক্ত করে।"[৩]

এছাড়াও তিনি ধাঁধাকে সাহিত্যিক ও লৌকিক দুটি শ্রেনিতে ভাগ করে লৌকিক ধাঁধার অনুষঙ্গে সাহিত্যিক ধাঁধা সৃষ্টির কথা বলেছেন। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে এবং আধুনিক সাহিত্যেও যার প্রয়োগ সচেতন ভাবে ঘটে চলেছে। আলোচ্য 'জানগুরু' উপন্যাসেও তারই বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। মড়াশোল গ্রামের নিবাসী পশুপতি বাউরীর ছেলে মাস কয়েক ধরে জ্বরে ভুগলে, পশুপতি ষোলআনার কাছে বৈঠক প্রার্থনা করে। বৈঠকে বাউরীপাড়ার মোড়ল পীতাম বাউরী তাদেরকে জরকা-পাকসাড়ার জানগুরু ছতর বাউরীর কাছে যাবার পরামর্শ দেয়। ছতর বাউরী সেখানকার একজন গণ্যমান্য ব্যাক্তি, পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান। তাই সেখানে যাবার সময় মড়াশোলের লোকেরা পথের ক্লান্তি দূর করতে নিজেদের মধ্যে কয়েকটি ধাঁধা নিয়ে আলোচনা করে। যেমন -

"উপরে বাসা তলে ডিম" [৪]

এই ধাঁধাটির অর্থ হল মউল। সাধারণত বাসার উপরে ডিম থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে ডিমের উপরে বাসা বাক্যটির সাহায্যে ধাঁধাটিকে চমকপ্রদ ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। সজনে গাছকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট একটি সুন্দর ধাঁধার পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। সজনে গাছের পাতা-ফুল-ডাঁটা তিনটি উপকরণ যে খাওয়া হয় তা ধাঁধার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উল্লেখিত আছে -

"গাছটির নাম লাল বিহারী
তাই ফলেছে তিন তরকারী।"[৫]

ধাঁধার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের আশেপাশের খুবই পরিচিত বিষয়গুলোই উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। যেগুলো অপ্রত্যাশিত কোনো উপমার সাহায্যে ব্যাক্ত করা হয়। যে রকম,

"ঘসর-ঘসর-ঘসকা
তিন-মুড় দুশ পা।"[৬]

এই ধাঁধাটির অভ্যন্তরে গ্রাম্য পরিবেশের নিত্যকার হালচাষের জীবিকার সন্ধান যেমন মেল। একইসঙ্গে ধাঁধার উত্তর দেবার প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষগুলোর উপস্থিত বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এর উত্তর হল হালের গরু এবং চাষি। জমিতে হাল দিয়ে চাষ করার সময় দুটি গরু ও একজন চাষির দরকার হয়। সুতরাং দুইটি গরু ও চাষি মিলে তাদের মোট তিনটি মাথা আর চারটি করে দুটি গরুর আটটি পা এবং চাষির দুটি পায়ের প্রসঙ্গই হল উক্ত ধাঁধার মূল উপজীব্য।

ধাঁধার মতোই প্রবাদের ব্যবহারও ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে বহুলাংশে। তিনি রাঢ়ের যে সকল মানুষের কথা তুলে ধরেছেন উপন্যাসে, সেই সব মানুষেরা লোকসংস্কৃতির একেবারে গভীরে বাস করে। কারণ রাঢ়বঙ্গ লৌকিক ঐতিহ্যের খনি হিসেবে পরিচিত। এখানকার মানুষেরা তাদের দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতা অনেক সময়ই প্রবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করে থাকে। মূলত প্রবাদের সাহায্যে মানুষ তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে সংক্ষিপ্ত আকারে ফুটিয়ে তোলে। যা উপমা, রূপক ছাড়াও অন্যান্য অলংকারের সহচর্যে প্রকাশিত হয়। হানীফ পাঠানের মতে-

> "কোনো দৈনন্দিন ব্যাপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অন্তরের গভীর অনুভূতি হইতে সমুৎপন্ন সহজ, সরস, সংক্ষিপ্ত, ব্যঞ্জনাময় প্রচলিত বাক্য বা বাক্য সমষ্টির নাম প্রবাদ।"[৭]

'জানগুরু' উপন্যাসের চরিত্রগুলোর সংলাপের মধ্যেও অসংখ্য প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যার গভীরে প্রবেশ করলে বাউরী, লোহার, শিকারিদের সমাজ জীবনকে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এছাড়াও উপন্যাসের কাহিনিকে ভগীরথ মিশ্র কতকগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদকে আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত করেছেন। এই নাম করণের মধ্যেও ঔপন্যাসিক বেশ কিছু প্রবাদের প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রবাদের সাহিত্যেক মূল্যকে যেমন অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছেন, তৎসঙ্গে উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছেন।

> "সব সূতার কুড় নাই মিলে
> সব বিদ্যা ইস্কুলে নাই পড়ায়।"[৮]

আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনামটিতে অর্থাৎ প্রবাদটিতে বাউরীপাড়ার জনসাধারণের চিন্তা ধারনা তথা সমাজ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের শুরুতে ছতর বাউরী প্রকৃতির সৃষ্টিতত্ত্বের গভীর রহস্যের কথা ব্যাখ্যা করে। তার মতে কোনো এক অদৃশ্য শক্তি আড়ালে থেকে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। যার রহস্য সন্ধান করা আমাদের সাধ্যের অতীত। তিনি জানান মানুষের পাপ-পুণ্য, কর্মফলের উপর নির্ভর করছে সে কোন জাতে জন্ম নেবে। এমনকি যার পাপের ভাগ বেশি তার গরু হিসেবেও জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে। ছতর বাউরীর এসব কথা সবার মনপুত হলেও প্রতিবাদ করে শুধুমাত্র হাইস্কুলের ইতিহাস বিভাগের মাষ্টার মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি। তিনি এর ব্যাখ্যা স্বরূপ মানুষের বিবর্তন তত্ত্বের কথা আলোচনা করেন। কিন্তু অশিক্ষিত জনগণের কাছে তার তত্ত্বের যৌক্তিকতা ফিকে হয়ে যায়। ছতর বাউরীর রহস্যাবৃত কথাতেই সকলে সায় দেয়। তাই নিজের জ্ঞানের অহমিকা প্রকাশ এবং মাষ্টার মশায়ের বিদ্যার সংকীর্ণতা বোঝাতে ছতর বাউরী উদ্দিষ্ট প্রবাদটি প্রয়োগ করে।

প্রবাদের সধারণ ধর্ম অনুযায়ী উপন্যাসের অপর একটি শিরোনাম মূলক প্রবাদে ফুটে উঠে তৎকালীন সমাজে লোকবিশ্বাসের আড়ালে ভণ্ডামির পরিচয়। প্রবাদটি এ রকম -

> "জনকুঁদরা হইলে সহায়
> আঁটকুড়িও বাচ্চা বিদায়।"[৯]

এই জনকুঁদরা হল সন্তান কামনার দেবতা। সাধারণ বিশ্বাস মতে নিঃসন্তান নারীও জনকুঁদরার আশীর্বাদে সন্তান লাভ করতে পারে। তবে বিষয়টি যাই হোক না কেন, আসলে এই জনকুঁদরা স্থাপন করার নাম করে গুণীনরা সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে নিঃসন্তান রমণীদের সম্ভোগ করত। গুণীনদের যৌন চাহিদা পূরণের এক প্রকার পন্থা হয়ে উঠেছিল জনকুঁদরা স্থাপন এবং তারা বংশ পরম্পরায় নারীদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিত। অনেকের কাছে এই সংস্কারের অন্ধকার দিকটি পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়লেও কেউই প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। কেননা সমাজের প্রচলিত প্রথাকে বিশ্বাস না করলেও সমূলে উড়িয়ে দিতে গেলে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। ঔপন্যাসিক এই প্রবাদের মধ্যে দিয়ে কুসংস্কারের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা পাশবিকতাকে প্রকাশ করেছেন সুন্দর ভাবে। কিন্তু গ্রামের সহজসরল মানুষেরা সে বিষয়ে উদাসীন, তাদের অকপট বিশ্বাস জনকুঁদরার প্রতি –

> "অর্থসম্পদের জন্য যেমন ধন-কুঁদরা, সন্তানাদির জন্য তেমনি জন-কুঁদরা। ঠিক ঠিক ভাবে থাপন করতে পারলে কাচ্চা-বাচ্চায় ভরে যাবে ঘর। বাঁজা মেয়ার পেটেও বাচ্চা হব্যেক। হাড়মাশড়ার কৈলাশ সামন্তের ঘরে জন-কুঁদরা থাপনা করে বিয়ের পনের বছর বাদে ওর বউয়ের পেটে বাচ্চা এনে দিয়েছিল এই ধীরতেরই বাপ ঝলক পটিদার। বাপের সেই কীর্তির কথা এখনো এ তল্লাটের মানুষের মুখে মুখে ফেরে।"[১০]

উপন্যাসে দেখা যায় চুনারাম ও ফুলমতীর বিবাহের চার বছর কেটে গেলেও তাদের কোনো সন্তান হয়নি। এ নিয়ে ফুলমতীর উৎকণ্ঠার শেষ নেই। সন্তান লাভের আশায় সে কবচ-তাবিচ, জলপড়া, তেলপড়া, হত্যা-মানসিক, ঠাকুরের থানে ঢিল বাঁধা সব কিছুই চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। বর্তমানে সমাজের চোখে সে একজন বাঁজা মেয়ে বলে পরিচিত, পথে চলতে তাকে প্রতিনিয়ত নানা কটুক্তি শুনতে হয়। যদিও বৈবাহিক জীবনে সে সুখেই আছে। ফুলমতী তার দুঃখের কথা প্রাণের সখী সুন্দরীর কাছে প্রকাশ করলে উত্তরে সুন্দরী জানায় -

"অসময়ে ফলে না বিক্ষো, সময়েই ফলে।"[১১]

এই প্রবাদের মধ্যে দিয়ে আসলে সে ফুলমতীকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল। গাছ যেমন উপযুক্ত সময় হলে তবেই ফল দেয়, নারীর সন্তান লাভের ক্ষেত্রেও একই কারণ ব্যাখ্যা করে ফুলমতী। উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনায় এই সকল প্রবাদের পাশাপাশি আরোও অসংখ্য প্রবাদের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। যেমন-

"দত্ত দাড়ি, ভাঙ হাঁড়ি
সোমের হাট সুনুকপা'ড়ী।" [১২]
"পস্ত পুড়া, বিরির ঝোল
তবে জানবি মড়াশোল।" [১৩]
"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।"[১৪]
"বুড়া বইসের ছানা
মুতল্যে সোনাদানা
হাগল্যে হীরা মোতী।"[১৫]
"বাপকা বেটা, সিপাইকা ঘোড়া,
কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া।"[১৬] ইত্যাদি।

লোক সাহিত্যের শাখা হিসেবে ধাঁধা, প্রবাদের পাশাপাশি লোককথা বা লোককাহিনির উপস্থিতি 'জানগুরু' উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে রহস্যময় করে তুলেছে। মূলত বাউরী সমাজের কথা তুলে ধরাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্য বাউরীপাড়ার লোকমুখে প্রচলিত কিছু মিথের গল্প উপন্যাসে পাওয়া যায়। যে মিথগুলোর মধ্যে দিয়ে বাউরীরা তাদের অতীতের ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ' গ্রন্থের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয় –

> "মিথ্ তথা লোকপুরাণের সঙ্গে মিশে থাকে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, এমনকি সাহিত্যের নানা উপাদান। আমাদের প্রধান চারটি মহাকাব্য রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড এবং ওডিসির সঙ্গে মিথ্ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।"[১৭]

ভগীরথ মিশ্র জানগুরু অর্থাৎ গুণীনদের সৃষ্টি সম্পর্কে একটি অসাধারণ লোককাহিনি পচু বাউরীর কথার মধ্যে দিয়ে বর্ণনার করেছেন এবং যার উল্লেখ নাকি আদিবাসী শাস্ত্র-পুরাণে মধ্যেও আছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের ক্ষমতা যে কতটুকু স্বীকৃতি দেওয়া হত, মূলত সেটাই ধরা পরে উক্ত কাহিনির বিষয়বস্তুতে - প্রথমাবস্থায় পুরুষেরা মেয়েদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মারাংবুরুর কাছে গেলে, মারাংবুরু মেয়েদের শাসন করার গুণবিদ্যা স্বরূপ পুরুষদের শাল পাতায় রক্তের দাগ কেটে আনতে বলে। কিন্তু মেয়েরা আড়াল থেকে মারাংবুরুর পরামর্শ শুনে নিয়ে নিজেরাই পুরুষের ছদ্মবেশে মারাংবুরুর কাছে সেই মন্ত্র নেয়। যার ফলে পুরুষদের অবস্থা আরোও শোচনীয় হয়ে ওঠে। এরপর পুরুষেরা পুনরায় মারাংবুরুর কাছে গেলে, মারাংবুরু সমস্ত ব্যাপারটি বুঝতে পেরে অন্য একটি গুণবিদ্যা পুরুষদের দেয়। যাতে করে পুরুষেরা নারীদের বেশ ভালো ভাবে জব্দ করতে পারে। এভাবেই পরবর্তীতে ডাইন ধরার জন্য জানগুরুর সৃষ্টি হয়।

সুতরাং লোককাহিনীর কাহিনিগত বিন্যাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, এর মধ্যে শুধুমাত্র সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনের একটি মনগড়া কাহিনি থাকে, তা নয়। এর মধ্যে উক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান, তাদের জীবন চর্যার দিকটিও ফুটে উঠে।

লোককথার একটি অন্যতম একটি বিভাগ হল লোকপুরাণ। সৃষ্টির উৎস সন্ধানে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই, আর এই আগ্রহের উত্তর খোঁজার ফলস্বরুপ আবিষ্কৃত হয়েছে একাধিক লোকপুরাণের। স্যার জি. এল. গেম বলেছেন –

> "Myth is the science of a pre-scientific age."[১৮]

মিথগুলো আপাত ভাবে যুক্তিহীন বা অবিশ্বাস্য বলে বিবেচিত হতে পার। কিন্তু এর মধ্যে দিয়েই একটি জনগোষ্ঠীর সমাজ মানসিকতাকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। মিথের কাহিনির অভ্যন্তরে যে ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে সমাজ বিবর্তনের দিকটি স্পষ্ট হয়। উপন্যাসে উল্লেখিত একটি কাহিনি থেকে জানা যায় বাউরীদের জন্ম হয়েছে মা দুর্গার শরীরের ময়লা থেকে। সিংহের অভিসাপে দেবী দুর্গার শরীর ময়লায় আচ্ছন্ন হলে, দুর্গা দামোদর নদিতে স্নান করতে যায়। দামোদরের জলের স্রোতে ধৌত সেই ময়লা থেকেই কালো বলিষ্ঠ এক শ্রেণির মানুষের জন্ম হয়। যারা পরবর্তীতে বাউরী বলে পরিচিতি লাভ করে। পীতাম বাউরীর এরূপ রহস্যময় কথাবার্তা কাল্পনিক মনে হলেও বাউরী সমাজের কাছে ছিল খুবই গর্বের বিষয়। পীতামের উক্তিতে তা পরিস্ফুট –

> "আমরা সেই বাউরী-জাত, ম'লা বাউরী, মায়ের গা'র ম'লা থিকেই জনম্-আমাদ্যার, বুঝলে হে - এক্কেরে দেবী-অংশে জনম।"[১৯]

একইসঙ্গে পীতাম বাউরীর বর্ণিত অপর একটি কাহিনি থেকে জানা যায় যে, বাউরীরা আদতে ধর্মরাজের বংশধর –

> "কুত্তা আদপে কে, সিটা জানে না ত উয়ারা। ...কুত্তা হল্যাক স্বয়ং ধর্মরাজ। যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গযাত্রার পথ দেখাইছিল্যাক কুত্তার বেশে। আমরা ধর্মরাজেরই বংশধর হে।"[২০]

সামাজিক সংস্কার মেনে বাউরী সমাজের লোকেরা কুকুর মারা গেলে অশৌচ পালন করে থাকে। যে কারণে তাদেরকে কুকুরের জ্ঞাতিগোষ্ঠী মনে করা হয়। ফলে সমাজের চোখে তারা একপ্রকার হীন দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু পীতাম বাউরীর কথাতে হীনমন্যতার বদলে বংশগৌরবের পরিচয় লক্ষিত হয়। আসলে তারা এই সমস্ত লোককাহিনির মধ্যে দিয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে উঠে বাঁচার আশা করে মাত্র।

মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভাগুলির মধ্যে যে ধারাটি মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত অব্যাহত, তা হল সঙ্গীতচর্চা। আদিম মানুষ একসময় শরীরের নানা অঙ্গভঙ্গির মধ্যে দিয়ে শিকারের বর্ণনা দিত। পরবর্তীতে এর সঙ্গে সঙ্গীতের ব্যবহার শুরু হয়। ফলে ধীরে ধীরে সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল আদিম সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। তাদের আবেগ অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সঙ্গীতের মাধ্যমে। ভারতীয় সঙ্গীতকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে পরিশীলিত বা মার্গ সঙ্গীত এবং অপরিশীলিত সঙ্গীত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। অপরিশীলিত সঙ্গীতের একটি অন্যতম শাখা হল লোকসঙ্গীত। বৃহত্তর গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবন যার ভিত্তি ভূমি। 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ' গ্রন্থে লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> "লোকসঙ্গীত হল লোকসমাজ কর্তৃক মুখে মুখে স্বতস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি ও সুর সহযোগে গীত; সাধারণত কর্ম, প্রেম ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত একজাতীয় গান যা স্মৃতির মাধ্যমে বাহিত বলিষ্ঠ জীবনচেতনা ও সুরের ও গায়নরীতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে জীবনমুখী।"[২১]

ভগীরথ মিশ্রের একাধিক উপন্যাসে লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। আলোচ্য 'জানগুরু' উপন্যাসটিও যার ব্যতিক্রম নয়। লোকসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে টুসু উৎসব বাঁকুড়া জেলার মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় একটি লোকউৎসব। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত নানা উপাচারে নারীরা এই ব্রত পালন করে থাকেন। উপন্যাসে টুসু উৎসব উপলক্ষে পোরকুলের মাঠে মেলা বসে। এই মেলা দেখতে গিয়েছিল চুনারাম, সুফল, সুন্দরী ও ফুলমতী। এছাড়াও অনেক দূর দুরান্তের লোকজন এসেছিল এবং সেখানে উপস্থিত জনতার টুসু ভাসানের গান শুনতে শুনতে একসময় সুন্দরীও গান ধরে-

> "পরকূল দহের হদহদানি

পুঁটি মাছের উজানি
চল সখী চল দেইখত্যে যাব সেথা টুসুর মেলানী।"[২২]

এই গানে টুসু উৎসবকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মনের আনন্দানুভূতী ব্যাক্ত হয়েছে। পুঁটি মাছের উজানি অর্থাৎ পুঁটি মাছ যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে শ্রোতের বিপরীতে চলে, পোরকুলের দহে সেরকমই মানুষের ভিড় জমেছে। গানটির কথার মধ্যে দিয়ে পোরকুলের টুসুর ঐতিহ্য প্রকাশ পেয়েছে। এই মেলার উদ্দেশ্যে যাবার সময় সুফলের কণ্ঠেও একটা গান শোনা যায়। ফুলমতীর অনুরোধে সুন্দরীর মনকে আনন্দ দেবার জন্য সে একটি হালকা চালের গান গায় -

"ফুলম তেলে শিশি আঁধভরা
তোকে গাল দিব রে খালভরা
ফুলম তেলে - "[২৩]

সঙ্গীত মানুষের অন্তর্লোকের আবেগের বহিঃপ্রকাশ। প্রেম, বিরহের মতো হৃদয়াবেক ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিয়ষকে সুর সহযোগে পরিবেশন করাই হল সঙ্গীতের ধর্ম। যার মধ্যে দিয়ে একের সুখ-দুঃখ অন্যের হয়ে ওঠে অর্থাৎ সার্বজনীনতার লক্ষে উপনিত হয়। ফুলমতী ও সুন্দরী দুজনে খুব কাছের, ছোট থেকে তাদের বেড়ে ওঠা একই সঙ্গে। চুনারামের প্রতি ফুলমতীর মনের দূর্বলতার কথা সুন্দরীর কাছে চাপা থাকেনি এবং তার চেষ্টাতেই উভয়ের বিয়েও হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এই চুনারামের সঙ্গেই বিধবা সুন্দরীর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই সুফলের কাছে চুনারামের খবর জানতে চেয়ে বিরহী সুন্দরী গান ধরে -

"তুই এলি ভাই, আর একজনা কই?
আমি ভিজাঁইছিল্যাম চিড়া-দই
তুই এলি ভাই..."[২৪]

সাহিত্যে যেমন সমাজের ছবি প্রতিবিম্বিত হয় নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়ে। লেখকের কল্পনা শক্তির তুলির টানে আমাদের চারপাশের বিশ্বজগৎ নতুনভাবে প্রতিভাত হয়ে আমাদের কাছে। লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তুতেও সমাজের নানা দিক ফুটে উঠে। গ্রাম বাংলার সহজ সরল মানুষের কর্ম মূখর জীবন প্রবাহের বাইরেও যে একটি জগৎ আছে সেই জগতের সন্ধান দেয় লোকসঙ্গীত। এদের জীবনে অবসর যাপন বা বিনোদনের সেরকম কোনো আড়ম্বরতা নেই। তাই সাপ্তাহিক হাটকে কেন্দ্র করে এরা উৎসবের আয়োজন করে। উপন্যাসে সুনুকপাহাড়ী হাটের পরিচয় পাওয়া যায়। যে হাট এখানকার মানুষের কাছে পার্বণ। বাজারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার পাশাপাশি তাদের আনন্দ উৎসবের একমাত্র জায়গা। রাতের অন্ধকারে হাট থেকে ফেরত পথিকের গানই তার পরিচয় -

"রাজাকাটার গাঁজা দকানে
লিশা লেইগ্যে গেল একটানে...।"[২৫]

বস্তুত মানুষ মাত্রই সামাজিক সংস্কারে বিশ্বাসী এবং এর মূলে রয়েছে জাগতিক নানা কর্মকাণ্ড। প্রকৃতির রহস্য নিয়ে সাধারণ মানুষের জানার শেষ নেই। নিত্যনতুন বার্তা পাঠিয়ে প্রকৃতও যেন আমাদেরে অবাক করতে চাইছে। যার কিছুটা একেবারেই অধরা ও রহস্যময়। যার ফলে মানুষের মনে দানা বেঁধেছে বিশ্বাস ও সংস্কারের। যেগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে মানব সমাজে প্রচলিত। বিশ্বাস একান্তই ব্যাক্তিগত বিষয়, সব বিষয়ই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কিন্তু যদি একবার টিকে যায়, তাহলে সেটি সংহত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে বেশি সময় লাগে না। যা লোকবিশ্বাসের নামান্তর। আবার এই লোকবিশ্বাসের সঙ্গে যদি কোনো আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সংযুক্ত হয় তখন তা লোকসংস্কারে পরিণত হয়। আলোচ্য 'জানগুরু' উপন্যাসে একাধিক লোকবিশ্বাসের কথা উঠে এসেছে। বাউরী, লোহার, শিকারি সমাজের মানুষের জীবনের সঙ্গে এই লোকবিশ্বাস প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যেমন ছতর বাউরী জগতের সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণের কারণ হিসেবে এক অদৃশ্য শক্তির উপস্থিতির কথা বলেছেন। আকাশের চন্দ্র-সূর্য থেকে শুরু করে ভূপৃষ্ঠের ধূলিকণা পর্যন্ত যার আয়ত্বাধীন। যার অঙ্গুলি হেলনে দুনিয়ার সৃষ্টি বজায় রয়েছে। এথেকে তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস তথা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি ইহজীবন ও পরজীবনের কর্মফল অর্থাৎ পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম এবং সেই অনুসারে পরবর্তী জীবন লাভের কথা বলেছেন –

> "এই যে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জীব, ... ইখানেই বাপ, পাপ-পূর্ণ, কর্মফল, সুকৃতি। অনেক জনমের পুণ্যফলে তুই মানুষ হয়্যেছু। তাও তুয়ার কর্মফল কম, তাই তরে তুই বাউরী-ঘরে জনম লিয়েছু। আর মহান্তি মাষ্টারের পুণ্যফল বেশি, তিনি বামন-জাতে জনম লিয়েছেন।"[২৬]

যার যেরে তিনি মৃত্যুঞ্জয় মহান্তি মাষ্টারের মানুষের বিবর্তনের তত্ত্বকেও অবিশ্বাস যোগ্য বলে বিবেচিত করেছেন ও সকলের মনে ইশ্বর বিশ্বাসের বীজ রোপন করে দিয়েছেন।

নদীকে বাদ দিয়ে গ্রাম্য পরিবেশের কথা ভাবাই যায় না। গ্রামের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় নদীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নদীর জল পান করা থেকে শুরু করে, খেয়া পারাপার, মাছ শিকার, কৃষি কাজ প্রভৃতি বৃত্তির সঙ্গে জুড়ে আছে গ্রামের সাধারণ মানুষ। যা তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত রসদ জোগায়। নদীর সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তাই অনেক সময় এই নদীকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মনে নানা রকম লোকবিশ্বাস উদয় হয় এবং সেই লোকবিশ্বাস একসময় লোকসংস্কারে রূপান্তরিত হয়। উপন্যাসে টুসু উৎসবের সময় পোরকুলের মেলার দিন কাঁসাই নদীতে স্নান করা এখানকার মানুষের কাছে পুণ্য বলে বিশ্বাস। যে কারণে তারা সংস্কার বশত টুসু ভাসান উপলক্ষে মকরক্রান্তি তিথিতে এই নদীতে স্নান করে গঙ্গা স্নানের মতোই পুণ্য অর্জন করে। এককথায় গ্রামের সহজসরল মানুষের জীবনালেখ্য তুলে ধরাই ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতির গাছ, পাথর, পাখি, ছোট-বড় প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে যাদের বিশ্বাসের অন্ত নাই। লোহার, বাউরী, বাগদি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির একাধিক লোকবিশ্বাসের কথা লেখক তুলে ধরেছেন-

ক. বিকেল বেলা তিতোকালুই পোকা উড়লে খরা হবার সম্ভাবনা থাকে।
খ. সোনালী গাছের পাতার পেপতি বাজালে দেশে অনাবৃষ্টি হয়। অজান্তেই এই অপকর্মটি করার জন্য সুফল মুর্মু ছলে বেলায় হাড়মাসড়ার গজানন রায়ের হাতে মার খেয়েছিল।
গ. মেয়েরা লাঙল ধরলে খরা হয়, গাই দিয়ে লাঙল করালে খরা হয়। গোবর গাদায় হালমুরা পুঁতে দিলে অতিবৃষ্টি থেকে যায়।
ঘ. বাম চোখ লাফালে অমঙ্গল হয়।
ঙ. বাঁশ গাছে ফুল ধরলে কিংবা ইঁদুরে গাছের ছাল খুবলে খেলে দুর্ভিক্ষ, খাটারশাল হয়, ইত্যাদি।

এই সকল লোকবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি হল লোকসমাজ। নিরক্ষরতা অথবা অজ্ঞানতাই হল লোকবিশ্বাসের মূল কারণ, তবে সব ক্ষেত্রে নয়। এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে মানুষ মাত্রই অসহায়। এ প্রসঙ্গে দুলাল চোধুরী ও পল্লব সেনগুপ্তের মতামত লক্ষণীয় –

> "আমারা অনেকেই মনে করি সংস্কার মাত্রই অযৌক্তিক অর্থহীন ব্যাপার। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বহুসংস্কারের যেমন কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না, তেমনি এমন অনেক সংস্কারের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সেগুলির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা লাভ সম্ভব।"[২৭]

প্রত্যেক জনজাতির ক্ষেত্রে সংস্কার পালনের নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়মনীতি লক্ষ করা যায়। পৌরাণিক এবং লৌকিক উভয় প্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় এই নিয়মগুলি বর্তায়। নিয়ম বহির্ভূত যে কোনো আচরণই গর্হিত অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। যার ফলে অমঙ্গল নেমে আসতে পারে সামাজিক জীবনে। উপন্যাসে জাঁতাল পরব উপলক্ষে দেবতাকে ভোজ দেবার জন্য ফুলমতীর মামা সুঁচাদ বাউরীর কাছে কেনা মংলাকে শিকার করার সময় জঙ্গলে খুঁজে না পেয়ে গ্রামের মানুষ মনে করে, সুঁচাদ বাউরীর পালিত শুয়োরের হয়তো কোনো খুঁত আছে। তাই ঠাকুর তাকে গ্রহণ করবে না। এই জন্য হয়তো ঠাকুর মংলাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। ফলে অনেকে আগামী দিনের কথা ভেবে আশঙ্কা প্রকাশ করে। সুঁচাদ বাউরী পাড়ার মাতব্বরের একজন হওয়া সত্ত্বেও তাকে সমাজের রোষের মুখে পড়তে হয়। ক্ষোভে-দুঃখে এবং দেবতার অসন্তুষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে একসময় সুঁচাদ ফুলমতীর কাছে মংলাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করে –

> "যা, ডাক উয়াকে। তুই ডাকলেই উ বারাবেক! যিখেনেই থাকু বারাঁই আসবেক। যা, মা। লচেৎ ঠাকুর বলি পাব্যেক নাই। সারা পাড়া শাপে পইড়ব্যাক। খরা হব্যেক, অজন্মা হব্যেক, ঘরে ঘরে

> মায়ের দয়া। একটি পেরানীও বাঁইচব্যেক নাই। আর ই সবের তরে তুয়ার মামা-বংশকেই দায়ী কইরব্যাক সক্কলে। যা, যা মা। ডাক উয়াকে।"[২৮]

সামাজিক বিধি মেনে দেবতার থানে পশু বলি দেবার রীতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। বাউরী, লোহার, শিকারীদের মধ্যেও এই ধারা প্রচলিত। তেমনি দেবতার প্রতি তাদের যে অকুণ্ঠ ভক্তি তা সুঁচাদ বাউরীর উক্তিতে স্পষ্ট।

বর্তমান শতাব্দীতে দাড়িয়ে আমরা শিক্ষাদীক্ষায় যতই উন্নতি করি না কেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোকে এখনো বিসর্জন দিতে পারিনি। তাই ভূত, প্রেত, আত্মার অস্তিত্বকে আমরা এখনো বিশ্বাস করি। মানুষের স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে হঠাৎ অদলবদল ঘটে যাওয়াকে অনেক সময় ভূতে ধরেছে বলে মনে করা হয় এবং এর থেকে রেহাই পেতে ওঝা বা গুণীণের মন্ত্রপুত তেল জলের ঘটা পড়ে যায়। অশরীরী আত্মার কল্পনা ও তাদের বশ করতে বিভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। উপন্যাসের মধ্যেও দেখা যায় ধীরত পটিদারকে ভূত তাড়াবার আয়োজন করতে। সে একজন নামকরা গুণীন। খিঁচকা গাঁয়ের শশধর আচার্যের বউকে ভূত ধরলে ধীরতকে দেখা যায় মালসায় আগুন জ্বালিয়ে তাতে শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে, বেল কাঠের আগুন জ্বালিয়ে, ছেঁড়া জুতো পুড়িয়ে, বেত্রাঘাত করে ভূত তাড়াতে। ভূত তাড়াবার নামে ওঝা ডেকে নানারকম উপাচার করার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন বাউরী, লোহার, শিকারী সমাজের মানুষের কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে দেখা যায় সমাজের আর এক শ্রেণির মানুষ যারা সাধারণ মানুষের কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাসের সুযোগে নিজের ক্ষমতার পাশাপাশি আর্থিক উপার্জনের পথটিও সচল রাখতে। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত ওঝা-গুণীনদের যৌন লালসা তথা তাদের পাশবিক আচরণের দিকটিও স্পষ্ট হয় ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়। নন্দ রায়ের বাড়িতে আগুন লাগাতে গিয়ে আরতি ধরা পড়ে গেলে নিজের দোষ চাপা দেওয়ার জন্য ভূতে ধরার ভান করে। গ্রামের সাধারণ মানুষের সে বিষয়টি অজানা থাকলেও ধীরত পটিদারের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধীরত যজ্ঞের ব্যবস্থা করে। গুপ্তকালি পুজোর বিহিত দেয়। আসলে পূজার উপাচার উপলক্ষ মাত্র ধীরতের উদ্দেশ্য ছিল আরতিকে সম্ভোগ করা। লেখকের বর্ণনায় –

> "রাতের বেলায় আরতিকে নিয়ে একখানা খালি ঘরে ঢোকে ধীরত পটিদার। পূজার উপাচার সব গুছিয়ে নেয়। ঘরের দরজা-জানালা এঁটে দেয় শক্ত করে। তারপর জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে থাকে। বেলকাঠের আগুন জ্বেলে ঘি পুড়তে থাকে অবিরাম। পোড়া ঘিয়ের গন্ধে ভরে যায় ঘর। ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যায়। একটু বাদেই আরতির গলা চিরে বেরিয়ে আসে তীব্র আর্তনাদ, বাঁচাও গো - কে আছ - ওঝা মাইরে ফেইলল্যাক আমাকে।"[২৯]

ভগীরথ মিশ্রের 'জানগুরু' উপন্যাসের সমগ্র অংশ জুড়ে রয়েছে ডাইনি প্রথার মতো সামাজিক কুসংস্কারের প্রসঙ্গ। ডাইনি সন্দেহে নিরিহ নারীর উপর অত্যাচারের এক বিভৎস রূপ এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। শুধুমাত্র কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এই প্রথার প্রচলন শুরু হলেও সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ এই প্রথাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে। উপন্যাসে হাড়মাসড়া ও মড়াশোলের মাঝখানে 'কাঁশিবুড়ির চাক' নামে স্থানের পরিচয় আছে। সেখানে অতীতের কোনো এক সময় কাঁশি নামে এক বৃদ্ধাকে ডাইনি সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করে কবর দেওয়া হয়। ওই বৃদ্ধা নাকি নিজের নাতির ব্যাটার কলজে খেতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিল। এরপর থেকে কাঁশিবুড়ির চাক নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা রকম জনশ্রুতি প্রচলিত –

> "কাঁশিবুড়ির চাকের কাছাকাছি দিনের বেলাতেও হাঁটে না মানুষজন। রাতের বেলায় তো ত্রি-সীমানা মাড়ায় না। কাঁশিবুড়ি হেন সিদ্ধা ডাইনের লাশ রয়েছে যে মাটির তলায়, উট্যা ডাইন-কুলের তীর্থ বিশেষ। নিশুত রাতে, এলাকার মানুষজনের স্থির বিশ্বাস, আজ অবধি উই ভিটায় চলে ডাইনদের ক্রিয়াকলাপ। ...কথাটা বটে মিছা লয়, তাল্লাটের বহু মানুষ রাত-বিরেতে দূর থেকে দেখেছে সেই দৃশ্য।"[৩০]

আর এই কুসংস্কারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও ভয়কে কাজে লাগিয়ে কিছু মানুষ সকলের অগোচরে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের অসাধু কর্মকাণ্ড। দিনের আলোতেও যেখানে কাঁসিবুড়ির চাকে যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারে না রাতের অন্ধকারে সেখানে চলে চোরাচালানের কারবার। আবার অনেকে ডাইনি প্রথাকে সাধারণ মানুষকে শোষণের হাতিয়ার

করে নিয়েছে। যেমন গদাধর রক্ষিত মানুষের সম্পত্তি হরণের উপায় হিসেবে ডাইনি প্রথাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছে। অপরদিকে, পীতাম বাউরী সুন্দরী ও চুনারামের বিবাহের বাঁধা স্বরূপ ফুলমতীকে ডাইনি অপবাদ দেয়। উপন্যাসে ডাইনি প্রথার মর্মান্তিক হৃদয়হীণতার ছবি ধরা পরে মানদা শিকারীকে কেন্দ্র করে। মনসারামের স্কুলের বন্ধু ভিখুর মৃত্যুর কারণ হিসেবে শিবের ডাং-এর মানুষজন মানদাকে দোষ দেয়। ছতর বাউরীর সেই চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের ফলে মানদার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। সেখানকার উপস্থিত জনতার রোষের ও কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাসের পরিণাম হেতু তার হাটুর মালাইচাকি কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। ফলে বাকি জীবন মানদাকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হয়। তৎকালীন সময়ে ডাইনি প্রথা সমাজ জীবনে কি গভীর প্রভাব ফেলেছিল ও অসহায় নারীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিবার-পরিজনদের যে চরম সংকটের মুখোমুখি দাড় করিয়েছিল ঔপন্যাসিক তাকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন আলোচ্য উপন্যাসে।

যাদু বিশ্বাসের প্রতি মানুষের আস্থা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। দুনিয়ার জাগতিক কর্মকাণ্ডকে নিজের আয়ত্বাধীন করতে অর্থাৎ ক্ষমতার লোভে মানুষ অনেক সময় মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই মন্ত্র প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যেমন কতকগুলি নিয়ম আছে, তেমনি মন্ত্র প্রতিষ্ঠা কিংবা দীক্ষা নেওয়ার জন্যও নির্দিষ্ট বিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক। যার ফলে মানুষ হয়ে উঠবে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। 'জানগুরু' উপন্যাসেও 'বীরস্থাপন'-এর মতো সামাজিক লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানে দেখা যায় বঙ্কিম কুচলান অমাবস্যার রাতে তার বাড়ির ভিটের ঈশান কোনে গর্ত করে বীরস্থাপন করে। বীরস্থাপনের জন্য শুয়োরের মাথার হাড়, পেঁচার বিষ্টা, টিকটিকির জিভ, কালো কুকুরের নখ, মাদী ভাল্লুকের দাঁত, মাটির মালসায় মৈথুন করেনি এমন পাঁঠার রক্ত ইত্যাদি নানা সামগ্রী দিয়ে তন্ত্রমন্ত্র সহযোগে একটি বাঁদরের বাচ্চাকে সেখানে পুতে দেয়। প্রচলিত বিশ্বাস মতে বীরস্থাপন করলে সেই ব্যক্তি বীরের সাহায্যে অলৌকিক সব কাজ সহজেই করতে পারবে। এমনকি বীর তার দাস হয়ে আজীবন প্রভুত্ব শীকার করে নেবে এবং তার কথা মতো সমস্তরকম আদেশ পালন করবে। মানুষের বিশ্বাসের উপর গড়ে ওঠা এধরনের লোকসংস্কার আপাতভাবে অমানবিক হলেও বাউরী লোহারদের কাছে এটি ছিল সমাজজীবনে চলে আসা একধরনের সংস্কার। তথা তন্ত্রসাধনার বিশেষ প্রক্রিয়া।

উপরিউক্ত আলোচনার সূত্রে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের জীবন্ত দলীলের স্বাক্ষর রাখে আলোচ্য 'জানগুরু' উপন্যাসটি। ভগীরথ মিশ্র তাঁর শিল্পী সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষদেরকে যেভাবে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন তাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন উপন্যাসটির প্রতিটি অনুচ্ছেদে। লোকখাদ্য, লোকচিকিৎসা, লোক বাদ্যযন্ত্র কোনো কিছুই তাঁর লেখায় বাদ যায়নি। গ্রামীণ সংহত লোকসমাজের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে তিনি ভিন্নমাত্রা প্রদান করেছেন। বাউরী, লোহার, শিকারী জনজাতির দৈনন্দিন জীবনচর্যার ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের আচরিত লোকসংস্কৃতিকে তথ্য সহকারে পরিবেশন করে তিনি সেগুলি জিইয়ে রাখার কাজটি সহজ করে দিয়েছেন। যার ফলস্বরূপ সমাজ মূল্যায়ণের ধারণাটি আমাদের সকলের কাছে স্পষ্টভাবে ফুঁটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. মিশ্র, ভগীরথ, 'আমার গল্প ভাবনার একদিক', 'উত্তরাধিকার'- সাম্প্রতিক বাংলা গল্প সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃ. ৩২
২. সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী, ২০১০, পৃ. ২০২
৩. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'বাংলার লোকসংস্কৃতি', ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪২, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ১০১
৪. মিশ্র, ভগীরথ, 'দুটি উপন্যাস, চারণভূমি, জানগুরু', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ,

জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ২৯৬
৫. তদেব, পৃ. ২৯৭
৬. তদেব, পৃ. ২৯৭
৭. পিন্টু, ড. আশরাফ, 'বাংলাদেশের প্রবাদে সমাজজীবন', আনন্দধারা, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, পৃ.১৭
৮. মিশ্র, ভগীরথ, 'দুটি উপন্যাস, চারণভূমি, জানগুরু', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ২৩৩
৯. তদেব, পৃ. ৩৭৬
১০. তদেব, পৃ. ৩৭৮
১১. তদেব, পৃ. ২৫৪
১২. তদেব, পৃ. ২৩৬
১৩. তদেব, পৃ. ২৩৯
১৪. তদেব, পৃ. ২৩৯
১৫. তদেব, পৃ. ২৪৪
১৬. তদেব, পৃ. ২৪৮
১৭. চৌধুরী, দুলাল, সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, দ্বিতীয় সংযোজন, ২০১৩, পৃ. ৫৮০
১৮. তদেব, পৃ. ৫৭৯
১৯. মিশ্র, ভগীরথ, 'দুটি উপন্যাস, চারণভূমি, জানগুরু', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ৩১৩
২০. তদেব, পৃ. ৩১৫
২১. চৌধুরী, দুলাল, সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, দ্বিতীয় সংযোজন, ২০১৩, পৃ. ১৩৭-১৩৮
২২. মিশ্র, ভগীরথ, 'দুটি উপন্যাস, চারণভূমি, জানগুরু', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ২৮৯
২৩. তদেব, পৃ. ২৭৮
২৪. তদেব, পৃ. ৩১০
২৫. তদেব, পৃ, ২৩৭
২৬. তদেব, পৃ, ২৩৫
২৭. চৌধুরী, দুলাল, সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, দ্বিতীয় সংযোজন, ২০১৩, পৃ. ২২৭
২৮. মিশ্র, ভগীরথ, 'দুটি উপন্যাস, চারণভূমি, জানগুরু', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ২৯৫
২৯. তদেব, পৃ. ৩৭৪
৩০. তদেব, পৃ. ২৪৪